বহুরূপে অনন্যা আলাস্কা

সঞ্জীব রায়

আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এর অবস্থান উত্তর আমেরিকা এবং কানাডার পশ্চিম সীমানায়। এই আলাস্কা একসময় রাশিয়ার দখলে থাকা এক ভূখণ্ড ছিল। আড়াই মাইল প্রশস্ত বেরিং প্রণালী আলাস্কাকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সমগ্র আলাস্কার এক-তৃতীয়াংশের অধিক ভূখণ্ড সুমেরু বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত। গ্রীষ্মে সুমেরু অঞ্চলে কুড়ি ঘণ্টাই দিন, বাকি সময়টা বিকেল। রাত বলে কিছু মালুম হয় না। এই ভূখণ্ড হল চিরতুষারাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চল। এই বিস্তৃত অঞ্চলে না ছিল কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ, না ছিল কোনও আয়ের উৎস। ফলে রাশিয়ার কাছে এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই এক অর্থনৈতিক বোঝা। তদুপরি, সুমেরু বৃত্ত থেকে আগত এস্কিমোদের ভরণপোষণের দায়িত্ব রাশিয়াকেই বহন করতে হত।

আলাস্কার বসবাসকারীরা 'আলাস্কা' বলে না, বলে আলিয়েস্কা। বহুপূর্বে আলাস্কা সেই নামেই পরিচিত ছিল। আলিয়েস্কা কথাটি এস্কিমোদের আলিয়ুট ভাষার অঙ্গ যার অর্থ গ্রেটল্যান্ড বা মহাভূমি। সেই শব্দ থেকেই বর্তমান 'আলাস্কা'র উৎপত্তি। অবশ্য এ-ব্যাপারে দ্বিমত আছে। অনেকে মনে করেন আলাস্কা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'Object to which the action of the sea is directed.'

১৮৬৫ সাল থেকে আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নজরে আসে। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনের সেক্রেটারি উইলিয়াম হেনরি সিওয়ার্ড এবং রাশিয়ার মন্ত্রী ব্যারন এডওয়ার্ড দে স্টয়কেলের মধ্যে আলাস্কা কেনাবেচার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু হয়। অত্যন্ত বিচক্ষণ জনসন সহজেই বুঝতে পারেন যে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম সুযোগেই আলাস্কার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। ফলে জনসন প্রচণ্ড দরদাম শুরু করেন। শেষমেষ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জলের দরে আলাস্কা কিনে নিল রাশিয়ার কাছ থেকে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ১৮৬৭ সালের ২৯ মার্চ। চুক্তিতে লেখা হল যে রাশিয়ার দখলে থাকা আলাস্কার ৫,৮৬,৪১২ বর্গমাইল আয়তনের ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছ থেকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর হচ্ছে মাত্র ৭২ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে। হিসাব কষলে দাঁড়ায় প্রতি একর জমির দাম মাত্র ২ সেন্ট। একে বোধকরি জলের দরের থেকেও কম বলা চলে। এত সস্তায় কেনা সত্ত্বেও আমেরিকার

রাষ্ট্রপতিকে এজন্য দেশের মানুষের কাছে সমালোচিত হতে হয়েছিল। দেশবাসী আলাস্কা ক্রয়ের নাম দিয়েছিল সিওয়ার্ড'স ফোলি বা সিওয়ার্ড'স আইসবক্স। আলাস্কা কেনার ব্যাপারে সেনেটের চূড়ান্ত সম্মতি আদায় করতেও রাষ্ট্রপতি জনসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক যুগ পর, ১৮৮০ সাল নাগাদ আলাস্কায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। একেই বলে কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। রাশিয়ার তখন আফসোসের আর শেষ নেই। প্রথম স্বর্ণখনির আবিষ্কার হয়েছিল ইউকোন নদীর মোহনায় চল্লিশ মাইল ভিতরে ক্রিক অঞ্চলে। আলাস্কার বর্তমান রাজধানী জুনোয় ১৮৮৬ সালে ঘটেছিল স্মরণীয় 'গোল্ডরাশ'। কথিত আছে জুনো নামের এক মাতাল নাকি প্রথম সোনার খোঁজ পায়। তার নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ হয়। তার ভাগ্যে অবশ্য কিছুই জোটেনি। সে বেচারা মারা যায় কপর্দকশূন্য হয়ে। চাঁদা তুলে তার দেহ দেশে পাঠাতে হয়েছিল। রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কিনে নেওয়ার মূল উদ্যোক্তা উইলিয়াম সিওয়ার্ড-এর নামানুসারে ১৯০৩ সালে আলাস্কার নবপ্রতিষ্ঠিত শহরের নামকরণ হয় সিওয়ার্ড। ১৮৯০ সাল নাগাদ আরও স্বর্ণখনি আবিষ্কার হয়। সোনার খবর বাতাসের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সোনা পাওয়ার আশায় দেশবিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ উন্মাদের মতো ছুটে আসতে লাগল আলাস্কার দিকে। কিন্তু সোনা তো ক্ষীয়মাণ সম্পত্তি। কারণ তার জোগান যে সীমিত। অত্যধিক উত্তোলনের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে খনিতে সোনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেল। ততদিনে অবশ্য এলাকার জনবসতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ধীরে ধীরে সোনা পাওয়ার আশা ত্যাগ করে এলাকাবাসী নিজেদের স্বার্থেই অঞ্চলের উন্নয়নে হাত লাগাল। তবে অনস্বীকার্য যে 'গোল্ডরাশ' প্রকৃত অর্থেই আলাস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম সন্ধিক্ষণ। বর্তমান আলাস্কা সমগ্র বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক জায়গা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা পেয়েছিল। অন্যদিকে ১৯৫৯ সালে আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯ তম রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। আলাস্কার বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীনতা দিবস এবং আলাস্কার রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার উৎসব—এই দুটো উৎসবই একইদিনে অর্থাৎ ৪ঠা জুলাই পালিত হয়।

আলাস্কা সংক্রান্ত আলোচনায় এস্কিমোদের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। গ্রিনল্যান্ডের মতো আলাস্কারও বিশাল অংশ জুড়ে ছিল এস্কিমোদের বসবাস। তবে গ্রিনল্যান্ডে বসবাসকারী এস্কিমোদের সঙ্গে আলাস্কার এস্কিমোদের জীবনযাত্রার অনেক তফাত। আলাস্কার এস্কিমোরা কখনও ইগলুতে বসবাস করেনি। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার সময় আপৎকালীন পন্থা হিসাবে বরফের ঘর বানিয়ে তারা বিশ্রাম নিত। বেরিং প্রণালীর উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের কারণে আলাস্কার আবহাওয়া গ্রিনল্যান্ডের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। এখানে গাছপালা অপ্রতুল হলেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। এখানকার আদি অধিবাসী হিসাবে এস্কিমোরা কাঠের ব্যবহার জানত। আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে কাঠের ঘর বানানো, প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রভৃতির ব্যাপারে আলাস্কার এস্কিমোরা গ্রিনল্যান্ডের এস্কিমোদের তুলনায় অনেকটাই উন্নত ছিল। তাছাড়া তারা ছিল প্রচণ্ড সাহসী ও শিকারে অত্যন্ত পটু। নিজেদের হাতে তৈরি করা কায়াকে (ছোট ডিঙি নৌকা) চড়ে বর্শার সাহায্যে এরা হাঙর শিকার করত। এদের মধ্যে অবশ্য অনেক গোষ্ঠী ছিল, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান গোষ্ঠী ছিল আলেউত

আলুতিক। আলাস্কা দেখার পর প্রত্যেক পর্যটকের মনে একটা সাধারণ প্রশ্নের উদয় হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঊনপঞ্চাশতম প্রদেশটি ঠিক কতটা বড়। মার্কিন প্রদেশের অংশ হিসাবে এখানকার লোকজন ইংরেজিতে কথা বলে, কেনাকাটায় ডলার ব্যবহার করে, তথাপি সেখানকার বিস্তীর্ণ তটরেখা, বিশাল অঞ্চল জুড়ে বরফঢাকা পর্বতমালা, গ্লেসিয়ার সহ ফিয়র্ড দেখতে দেখতে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক যে এ বুঝি আর-এক বিশ্ব। একবার মাত্র ভ্রমণের মাধ্যমে এর বিশালতার সামান্য অংশেরই আস্বাদন নেওয়া সম্ভব।

অবস্থানগতভাবে আলাস্কার উল্লেখযোগ্য কোনও স্বীকৃত সীমা না থাকলেও সমগ্র আলাস্কাকে ছয়টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে : দক্ষিণ-মধ্য, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, অভ্যন্তর বা Interior, তুন্দ্রা অঞ্চল বা North Slope এবং আগ্নেয়গিরি অঞ্চল বা Aleutian Islands.

আলাস্কার ব-দ্বীপে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রচুর, অনেকগুলো এখনও জীবন্ত। তাদের মধ্যে অন্যতম মাউন্ট শিশালদিন। সেখান থেকে এখনও লাভা নির্গত হয়। এই পর্বতের সঙ্গে জাপানের মাউন্ট ফুজির যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বর্তমান আলাস্কার অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে মৎস্য শিকার, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেলের উপর যেহেতু এগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়াও পর্যটন শিল্প থেকেও এর আয় ভালই। ২০১৫ সালের সরকারি লোকগণনা অনুযায়ী আলাস্কার লোকসংখ্যা ৭,৩৮,৪৩২।

কানাডার উপকূলবর্তী শহর ভ্যাংকুভারের রামাডা হোটেল থেকে সকাল সাড়ে নটায় রওনা দিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ জাহাজ জেটিতে হাজির হলাম। সেখানে আমাদের জন্য 'হল্যান্ড আমেরিকান লাইন'-এর জাহাজ 'ভোলেন্ডাম' অপেক্ষা করছিল। জাহাজের ভিতরে গিয়ে বাস দাঁড়াল। প্রথমে ভেবেছিলাম 'ভোলেন্ডাম' বুঝি কোনও ব্যক্তির নাম। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে ওই নামে নেদারল্যান্ডে জেলেদের একটি গ্রাম আছে। আমরা রয়েছি কানাডার ভ্যাংকুভারে, যাব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায়। অতএব প্রথা অনুযায়ী কানাডা বিদায় জানাল এবং আমেরিকা স্বাগত জানাল। ইমিগ্রেশনের নিয়ম অনুসারে দুহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ ও মুখের ছবিসহ যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান মিনিট কয়েকের মধ্যে জাহাজেই সম্পন্ন হল। আমরা সবাই আমাদের লাগেজ বাসের ডিকিতে রেখে জাহাজের ডেকের মধ্যে যে যার নির্দিষ্ট রুমে ঢুকে পড়লাম।

আকর্ষণীয় পুরোদস্তুর ঘর দেখে রীতিমতো ভাললাগায় মন ভরে গেল। কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কা করেছিলাম যে এবারেও বোধহয় খুবই ছোট জায়গা হবে, নড়াচড়া করতে বা লাগেজ রাখতে অসুবিধা হবে। কিন্তু তা একেবারেই নয়। এক্কেবারে ফুলপ্রুফ হোটেলের ঘর! একটি ঘরে যা যা থাকা প্রয়োজন, সব আছে। সোফা, টেবিল, টিভি, বিশাল বড় মাপের খাট (ডাবল), লাগোয়া বাথরুম ইত্যাদি। এই ঘরেই নয় নয় করে সাতটি রাত কাটাতে হবে।

বেলা একটা নাগাদ ব্যুফে লাঞ্চ সেরে ফেলা গেল। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সবই জাহাজের আট তলায় (ডেকে)। নিজের ইচ্ছামতো খাবার নিয়ে খোলা জায়গায় সমুদ্র দেখতে দেখতে অথবা রেস্টুরেন্টের ভেতরেও বসা যায়। আইসক্রিম, চা, কফি, জুস খেতে হলে রেস্টুরেন্টে যেতে হবে। সেখানে খাবারের বৈচিত্র্য বেশি। কোনও জায়গায় এশিয়ার খাবার, কোথাও ইউরোপিয়ান খাবার, কোথাও বা মিক্সড। দু-জায়গাতেই নিজের পছন্দমতো খাবার অর্ডার দিলে বানিয়ে দেয়। প্রথমদিন বাইরে বসেই লাঞ্চ সেরে নিজের কেবিনে চলে এলাম। এসে দেখি সবার লাগেজ কেবিনের

বাইরে রাখা আছে। জাহাজের ব্যবস্থাপনার কোনও জুড়ি নেই। প্রতি তিন-চারটি কেবিন পিছু দুজন অ্যাটেনডেন্ট রয়েছে। আমাদের জন্য নির্ধারিত ছেলে দুটির নাম এলি ও বার্ডি। ইন্দোনেশিয়ায় বাড়ি। জাহাজের কর্মচারীদের অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের লোক। আমাদের ডেকের সুপারভাইজারের নাম ম্যাথু, কেরালায় বাড়ি। বিদেশিদের মাঝে একজন স্বদেশিকে পেয়ে খুব ভাল লাগল। ম্যাথু আমাদের আশ্বস্ত করল, কোনও অসুবিধা হলেই তাকে বলতে।

আমাদের জাহাজটি প্রকৃত অর্থেই যেন একটি চলন্ত আনন্দনগরী। নানা দেশের সচ্ছল মানুষদের ছোট ছোট এক-একটি গোষ্ঠী। কী নেই এই জাহাজে! থিয়েটার হল থেকে শুরু করে, সুইমিং পুল, জগিং ট্র্যাক, টেবিল টেনিস কোর্ট, হরেক কিসিমের কেনাবেচা, নিলাম, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। জাহাজের দুধারে চেয়ার নিয়ে বসে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। ঘরে থাকা মাইক্রোফোন জানিয়ে দিল যে জাহাজ ছাড়ার আগে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে তিন নম্বর ডেকে উপস্থিত থাকতে হবে। সেখানে দেখানো হল কীভাবে লাইফবেল্ট বাঁধতে হবে, বিপদের সময়ে কী কী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আশু কর্তব্য। জাহাজ ছাড়ল ঠিক বিকেল চারটেয়। এই প্রমোদতরী ভ্যাংকুভার থেকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার শেষ প্রান্ত অবধি গিয়ে আবার ভ্যাংকুভার ফিরে আসবে। পরদিন ২৩ মে সকাল থেকেই ইনসাইড প্যাসেজ দিয়ে জাহাজ চলছে প্রায় তীর ঘেঁষে। তীরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে বড় বড় সেভার গাছের ঘন জঙ্গল, সবুজে ঢাকা পাহাড়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা যে প্রাণান্তকর তা নয়, তবে হাওয়াটা যথেষ্ট ঠান্ডা। কানঢাকা টুপি না থাকলে বিপদ আছে। পরদিন থেকে প্রায় প্রতিদিন এক্সকারশান ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। তবে সেগুলি নিজস্ব বাড়তি খরচে। জাহাজে সাতদিন কাটানোর জন্য প্রতিদিনের সার্ভিস চার্জ মাথাপিছু ১৫ ডলার। সেটি বাধ্যতামূলক। এক্সকারশান ট্যুরের ব্যবস্থা পাকা করতে যেদিনের ট্যুর, তার আগেরদিন বেলা বারোটার মধ্যে জাহাজের নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে ট্যুর বুক করতে হবে। আমরা কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে পরের তিনদিনের তিনটি ট্যুর বুক করে নিলাম। সেগুলি যথাক্রমে—২৪ তারিখ গ্লেসিয়ার ও তিমি মাছ দেখতে যাওয়া; ২৫ তারিখ বরফের উপর দিয়ে রেলভ্রমণ (White Pass and Yukon Railway Trip) এবং হেলিকপ্টারে গ্লেসিয়ার উপত্যকায় পৌঁছে কুকুরে টানা স্লেজগাড়ি চড়া। ২৬ তারিখ জাহাজ কোথাও দাঁড়াবে না। ওইদিন তার অবিরাম চলা। ২৭ তারিখ টোটেম পার্ক বা স্যাক্সম্যান নেটিভ টোটেম ভিলেজ দেখতে যাওয়া। এছাড়াও হাজার রকমের ট্যুর আছে। তবে একইসঙ্গে দুটি ট্যুর করতে গেলে জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার ভয় আছে। সেই প্রসঙ্গে একটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করলে ভবিষ্যতে যাঁরা আলাস্কায় যাবেন তাঁদের প্রয়োজনে লাগতে পারে। জাহাজের কাউন্টার থেকে ট্যুর বুক না করে জাহাজ যে-বন্দরে নোঙর করবে সেখানে স্থানীয় ট্যুর কোম্পানির কাছ থেকে অনেক কম খরচে টিকিট কেটে উক্ত ট্যুর করে ফেলা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা বড় ঝুঁকি থেকে যায়। যদি জাহাজ ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ফেরা যায় তাহলে জাহাজ কর্তৃপক্ষের কোনও দায়িত্ব থাকে না। জাহাজ আপনাকে ফেলে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু জাহাজ থেকে বুকিং করলে সে ভয় থাকে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বসেছিলাম ডাইনিং হলের কাঁচঢাকা রেলিঙের ধারে। যেদিকে তাকাই শুধু জলরাশি। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত, ধীর স্থির রূপ। জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই

একাধিকবার ডলফিনের দেখা মেলে। আলাপ হল থাইল্যান্ড থেকে আসা এই জাহাজে কর্মরত এক কর্মচারীর সঙ্গে। আমাদের ডেকের নাম ডলফিন ডেক। থাই কর্মচারীটির কাছ থেকে জানতে পারলাম প্রায় ১৫০০ জন যাত্রী এই জাহাজে চলেছেন আলাস্কা পরিদর্শনে। এই দেড় হাজার যাত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্বে যে-সমস্ত কর্মচারী আছেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৬০০। এখানে ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। খানিক বাদে উঠে গিয়ে কেবিন-লাগোয়া একচিলতে বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকা। জল আর নীল আকাশে আপনমনে উড়ে চলেছে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, আবার কখনও বা জলে আর বরফ টুকরোর উপর বসে তারা ভেসে চলেছে। বিকেল নাগাদ একাধিক তিমি মাছের জল ছেটানো দেখতে পাওয়া গেল। এতই অকস্মাৎ যে ক্যামেরা রেডি করার সময়টুকুও পাওয়া গেল না।

২৪ মে, শুক্রবার। বেলা একটার সময় জাহাজ আলাস্কার রাজধানী জুনোতে নোঙর করল। জুনোতে স্থলপথে যাতায়াতের কোনও উপায় নেই। জলপথ বা আকাশপথই ভরসা। এই সেই জুনো যেখানে গোল্ডরাশ প্রথম শুরু হয়। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে জুনোর বন্দর এলাকা। জনবহুল, যানবহুল, দোকানপাটের সমারোহ। দোকানগুলিতে বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনির, আলাস্কা ছাপমারা গেঞ্জি সহ বিভিন্ন জিনিসের ঢল। এখানকার পাথরের গহনার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সব দোকানেই অবশ্য স্বদেশি হস্তশিল্প, পাথরের শ্বেতভল্লুক বিরাজমান। একাধিক দোকানে রুশশিল্পীদের হস্তশিল্পের পসরা।

জুনোর বন্দর এলাকা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলে আলাস্কা স্টেট মিউজিয়াম। আলাস্কার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি পর্বই এখানে দেখা যায়। আলাস্কায় সব জিনিসের দাম একেবারে আকাশছোঁয়া, তথাপি স্মারক হিসেবে কিছু সংগ্রহ করতেই হল। জাহাজ থেকে জুনোতে নামার পর বাসে উঠে শহরের ভিতর দিয়ে চললাম প্রায় মিনিট চল্লিশ। আলাস্কার বাসের নাম হল পিপল মুভার। বাসের সামনে দুটো সাইকেল রাখার ব্যবস্থা আছে। এই দেশ বাস্তবিকই প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবে। বাসে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের সামনের দিকের দরজাটা নিচু করে ফুটপাথের সমতলে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটা পাটাতনের মতো জিনিস নেমে আসে। ওই পাটাতনের উপর দিয়ে প্রতিবন্ধী মানুষটি তাঁর হুইল চেয়ার চালিয়ে সোজা বাসের ভিতর গিয়ে তাঁর জন্য চিহ্নিত নির্দিষ্ট সিটে বসেন। বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কোমরে বেল্ট বেঁধে দেওয়া হয়। এই বেল্ট বাঁধা-খোলা সবকিছুই সুইচের সাহায্যে ড্রাইভারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পিপল মুভারে চড়ে সারাদিন একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করা যায়। ভাড়া মাত্র ২ ডলার।

বাস নামিয়ে দিল স্টিমার ঘাটে। স্টিমারে উঠে চললাম তিমি অভিযানে। মাঝসমুদ্রে গিয়ে তিমি ও সিন্ধুঘোটকের সন্ধান মিলল। একাধিকবার তিমির ডানা ঝাপটানো, জল ছেটানো দেখা গেল। আরও একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। বাচ্চা তিমিরা সিন্ধুঘোটকের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে। সে এক মজার দৃশ্য। অনেকেই সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করলেন। ছোটবেলাটা বোধকরি এমনই হয়, কোনও বাছবিচার থাকে না। বড় হলেই অন্যরকম। এই তিমিরাই বড় হয়ে সিন্ধুঘোটকদের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

স্টিমার চলেছে দুধারে অসাধারণ সৌন্দর্যের আলাস্কাকে সঙ্গে নিয়ে। সাদা বরফে মোড়া পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর। তিমি দেখা শেষ করে স্টিমার কর্তৃপক্ষের পরিবেশিত গরম চকোলেট ও গরম কফি পান করে এবার চললাম মেন্ডেনহল গ্লেসিয়ারের উদ্দেশে।

গ্লেসিয়ারের অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার পর বেশ খানিকটা হেঁটে সংলগ্ন টনগ্রাস ন্যাশনাল পার্কের ভিতর নাগেট ঝরনা দূর থেকে দেখেও দারুণ লাগল। একেবারে সামনে থেকে দেখতে গেলে অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হয়। জনমানবহীন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় একাধিক জায়গায় সাইনবোর্ডের মাধ্যমে ভালুক থেকে পথচারীদের সাবধান করা হয়েছে।

২৫ মে, শনিবার। কাকভোরে জাহাজ এসে দাঁড়াল স্ক্যাগওয়েতে। সকাল নটায় আমরা রওনা দিলাম হোয়াইট পাস এবং ইউকোন রুট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গ্লেসিয়ার সঙ্গে নিয়ে এক অসাধারণ তিন ঘণ্টার ট্রেনযাত্রায়। এ-পথের দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল। ট্রেন গিয়ে আবার নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে আসে। এই রেলপথের সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৮৮৫ ফুট বা ৮৭৯ মিটার।

যেমন চমৎকার ট্রেনের কামরা, তেমনই চমৎকার আবহাওয়া। রোদ ঝলমলে সকাল। ট্রেনযাত্রাকালে একটি জায়গায় কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পাশাপাশি রাখা দেখলাম। এখান থেকেই এদের সীমানা ভাগ হয়েছে। ট্রেন থেকে নামাওঠার কোনও ব্যবস্থা নেই। মাঝারি আকারের পাঁচ কামরার ট্রেন, ডিজেল ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই জানালার সামনে বসে একমনে সৌন্দর্যের সাগরে ডুব দিয়েছেন। একাধিক টানেল পেরিয়ে যাচ্ছে। বরফের উপর সূর্যদেবের আলোকচ্ছটায় চারিদিক যেন শুভ্রতার আলোকে ঝলমল করে উঠছে। বরফকে সঙ্গে নিয়ে পাইন গাছগুলি কিন্তু দিব্যি আছে। ট্রেনে যেতে যেতে উপলব্ধি করলাম, ছেলেবেলায় যা কিছু স্বপ্ন দেখেছি ট্রেনযাত্রা নিয়ে তার সবই যেন দেখতে পাচ্ছি এই রেলভ্রমণে। আমাদের অনেকেরই ভ্রান্তধারণা আছে যে আলাস্কা ভ্রমণ মানেই শুধু জাহাজে সমুদ্রবিহার। কিন্তু একেবারেই তা নয়। রেলপথে আলাস্কা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও অসাধারণ, তুলনাহীন। ট্রেনযাত্রা সেরে কোনওরকমে জাহাজে ফিরে দ্রুত মধ্যাহ্নভোজন সারা হল, হেলিকপ্টারে গ্লেসিয়ার উপত্যকায় যাওয়ার জন্য। প্রতি হেলিকপ্টার পিছু ছ-জনের দল। মেঘের ভিতর দিয়ে গিয়ে গ্লেসিয়ারের মাথায় গিয়ে নামা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এটি পূর্বনির্ধারিত সূচি হলেও একটু সংশয় ছিল কারণ গতকাল প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সেটি বাতিল হয়। সৌভাগ্য, আজকের রোদ ঝলমল দিনে গতকালের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ছোট্ট হেলিকপ্টারে পাহাড়ের দেশে গিয়ে কুকুরটানা স্লেজ গাড়িতে বরফের উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হলেও সারা জীবনের জন্য সে এক শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। এই সম্পর্কে যতই বলি না কেন, কোনও বলাটাই যথেষ্ট নয়। সেই শ্বেতশুভ্র বরফের রাজ্যে ভ্রমণ বড়ই রোমাঞ্চকর, এনে দেয় বড়ই আনন্দের এক অনুভূতি।

রবিবার, ২৬ মে। জাহাজযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। ভোরে ঘুম ভাঙল। পুরো জাহাজের লোক ৮নং ডেক সংলগ্ন ছাদে এবং ৯নং ডেকের ছাদে উঠে পড়েছে। সকলের মধ্যে আনন্দ ও উত্তেজনার আভাস। আমাদের জাহাজ 'Glacier Bay' তে প্রবেশ করছে। দূরে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ার বে ন্যাশনাল পার্কের জঙ্গল, অর্ধেক বরফে ঢাকা। সেটি ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংরক্ষিত জীবমণ্ডল এলাকা (largest UNESCO protected biosphere)। এর কিছু অংশ কানাডায় এবং কিছু অংশ আমেরিকায় পড়েছে। বিগত দুশো বছর ধরে ওই গ্লেসিয়ার পশ্চাদ্‌গমন করছে। এরই মধ্যে দ্রুতগামী ডিঙি নৌকা করে চলে এসেছেন জঙ্গলের রেঞ্জার সাহেব। জাহাজে উঠে তিনি মাইক্রোফোন নিয়ে গ্লেসিয়ার বে সম্বন্ধে চমৎকার তথ্য পরিবেশন করলেন। গ্লেসিয়ার বে ন্যাশনাল পার্ক বিশাল

জায়গা জুড়ে (২৪২৮ বর্গ কিলোমিটার) বর্তমান। নয় নয় করে সেখানে সাতটি গ্লেসিয়ারের উপস্থিতি। তাদের মধ্যে জন্‌স হপকিনস গ্লেসিয়ারের মুখ ক্রমশ একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। উত্তর আমেরিকায় এত বড়, এত লম্বা উপত্যকা-গ্লেসিয়ার আর নেই। সেই তুষারযুগ থেকেই শত শত গ্লেসিয়ার অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জাহাজ কাছে আসতে দেখা গেল প্রায় নব্বই মাইল দীর্ঘ বরফের এক জমাট পাঁচিল। ছয় মাইল চওড়া এবং তিনশো ফুট উঁচু। চোখের সামনে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। মাঝেমধ্যে বরফের চাঁইশুদ্ধু তুষারধস জলে পড়ে ঢেউয়ের সৃষ্টি করছে। গ্লেসিয়ারের সেই অপার্থিব রূপ দেখতে হলে জলপথেই আসতে হবে। ২০০৯-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে-বছর চার লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছশো তিপ্পান্ন জন পর্যটক গ্লেসিয়ার দেখতে এসেছিলেন। তার মধ্যে চার লক্ষ বাইশ হাজার নশো উনিশ জন এসেছিলেন আমাদের মতো বড় জাহাজে।

গ্লেসিয়ার বে

সবাই ছবি তোলায় ব্যস্ত। স্থিরচিত্র ও ভিডিও দুই-ই উঠছে। দেখার মতো দৃশ্য!! সে যেন এক বিশ্ব-মিলনমেলা। সেই নৈসর্গিক দৃশ্যের অংশীদার হতে পেরে সবাই যারপরনাই আপ্লুত। রোদ ঝলমলে দিন সবাই দারুণ মেজাজে উপভোগ করছে। রোদ থাকলেও প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া বইছে। অনেকেই মাথায় বিছানার কম্বল জড়িয়ে এসে বসেছেন। এক তরুণ দুহাতে ফ্লাস্ক নিয়ে গরম চকোলেট বিক্রি করছে। একটি ফ্লাস্কের দাম পঁচিশ ডলার। সঙ্গের ফ্লাস্কটা বিনামূল্যে স্যুভেনির হিসেবে দিচ্ছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্লেসিয়ার উধাও হয়ে গেল। আলাস্কা উপসাগর দিয়ে যাত্রা। আগামীকাল জাহাজ নোঙর করবে কেচিকানে। থাকবে সারাদিন। আমরা দেখব টোটেম পার্ক বা স্যাক্সমান নেটিভ টোটেম ভিলেজ।

২৭ তারিখ। কেচিকানে জাহাজ নোঙর করল বেলা দশটা নাগাদ। এটি আলাস্কার প্রথম শহর ও সলমন ক্যাপিটাল হিসেবে পরিচিত। জাহাজ ছাড়বে ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। তার মধ্যেই ট্যুর সেরে ফিরে আসতে হবে। জাহাজ থেকেই দেখা গেল কেচিকান বন্দর শহর রোদে ঝলমল করছে। এই কেচিকান বৃষ্টির জন্য কুখ্যাত কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমরা তা পাইনি, তবে যথেষ্ট গরম ছিল। টোটেম পার্ক এবং স্যাক্সমান নেটিভ টোটেম ভিলেজ দেখা হল। টোটেম এখানকার নিজস্ব শিল্প। মূলত জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে সেই কাঠের উপর শিল্পের সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়। পরে তার উপর রং চাপানো হয়। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন টোটেম সম্প্রদায়ভুক্ত। আমোদপ্রিয় এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের হাতের কাজ বাস্তবিকই নজর কাড়ে। এঁদের জনসংখ্যা খুব দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে। টোটেমদের বর্তমান জনসংখ্যা মাত্র শ-চারেকে এসে ঠেকেছে। নিজস্ব বাহারি রঙের পোশাক পরে ড্রাম বাজিয়ে উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে এঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথেষ্টই আকর্ষণীয়। বহু

পর্যটক, বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়রা পর্যন্ত টোটেমদের নাচের তালে তালে খুব মজা করে নাচছিল।

আমাদের জাহাজের সঙ্গে আরও দুটো জাহাজও কেচিকানে নোঙর করেছিল। তাদের মধ্যে নরওয়ের জাহাজখানা বিশাল বড় এবং খুব সুন্দর। এতগুলো জাহাজ নোঙর করাতে উৎসবের মেজাজ। দোকানে দোকানে পর্যটকদের ভিড়। ঢালাও জ্যাকেট, টি শার্ট, শার্ট, গেঞ্জি, বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর স্যুভেনির সব বিক্রি হচ্ছে। গেঞ্জি, শার্ট, জ্যাকেটের গায়ে আলাস্কা বা কেচিকান লেখা, নয়তো আলাস্কার কোনও বন্যপ্রাণীর ছবি আঁকা।

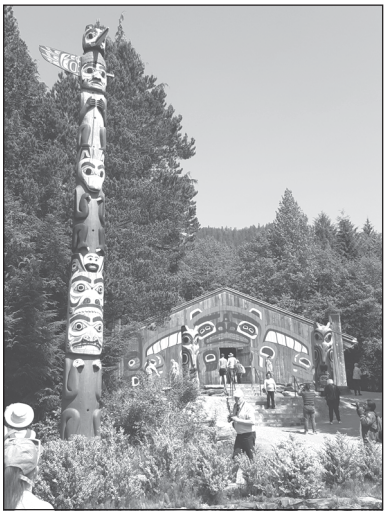

টোটেম পার্ক

২৮ মে। জাহাজ কোথাও আর নোঙর করেনি। সারাদিনরাত ধরে অবিরাম যাত্রা। আমরা আলাস্কা ভ্রমণের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আজই শেষ রজনী। মন ভারাক্রান্ত। আগামীকাল ভোরবেলা থেকে শুরু হবে বিদায়পর্ব। অনেক রাত অবধি সহযাত্রী-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হল। আড্ডার মধ্যে বিশেষ জায়গা জুড়ে ছিল আলাস্কা ভ্রমণের পর্যালোচনা। অধিকাংশই গ্লেসিয়ার বে-কে পছন্দের তালিকার শীর্ষে রাখলেন। হেলিকপ্টারে চড়ে গ্লেসিয়ারের মাথায় নেমে বরফের উপর কুকুরে-টানা স্লেজগাড়ি চড়াটা কারও কারও কাছে বেশি রোমাঞ্চকর, চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। তবে আলাস্কার আপেক্ষিক সৌন্দর্য নিয়ে যতই বিতর্ক হোক, সত্য হল এই যে—বহুরূপে আলাস্কা অনন্যা।

২৯ মে, বুধবার। ভোরবেলায় আমাদের জাহাজ ভোলেন্ডাম ভ্যাংকুভার বন্দরে এসে নোঙর করল। সাতদিনের সমুদ্রযাত্রার আজ সমাপ্তি। সাত-সাতটা দিন ও রাত জাহাজে আনন্দে, মেজাজে কাটানোর রেশ নিয়ে বন্দরে নামার তোড়জোড় শুরু হল। জাহাজের ডেক থেকেই দেখা যাচ্ছে দূরে 'ভ্যাংকুভার' লেখা। এ ঘোর চট্‌জলদি কাটবার নয়। আজ বুধবার, আগের বুধবারেই হয়েছিল আলাস্কা ভ্রমণের শুভারম্ভ। কী করে যে সাতটা দিন কেটে গেল, টেরই পাওয়া গেল না! এই স্বল্প পরিসরে আলাস্কার পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করা আশাতীত, তবে যেটুকু পেলাম তাকে স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিনের জন্য বেঁধে রাখার মতো যথেষ্টই ভাল সঞ্চয় বলতে হবে।

বরফের ওপর কুকুরে-টানা স্লেজগাড়ি